পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনা রীতি

ড. অণিমা মুখোপাধ্যায়

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বিষয় সূচি

	পত্রাঙ্ক
◆ গ্রন্থকারের নিবেদন	
◆ পুঁথি শব্দের উৎপত্তি ও ভাষাতত্ত্বগত তাৎপর্য - - - -	১৭
◆ পুঁথি সম্পর্কিত প্রাথমিক কিছু তথ্য ঃ - - - -	২১
(১) পুঁথির উপকরণ (২) আকার, (৩) অক্ষর, (৪) বিরাম চিহ্ন (৫) ভ্রম সংশোধনের চিহ্ন ও রীতি-নীতি (৬) পত্রাঙ্ক(৭) পুঁথির প্রকার ভেদ (৮) লিপিকাল (৯) লিপিকর (১০) গায়েন (১১) চিত্রকর (১২) পৃষ্ঠপোষক (১৩) ক্রয়-বিক্রয় (১৪) পুঁথি চুরি	
◆ আত্মকাহিনী - - - - - -	৮১
◆ ভণিতা - - - - - -	৯৭
◆ কবি শকাঙ্ক - - - - - -	১০৯
◆ অব্দ ও বর্ষ গণনা - - - - - -	১৫৭
◆ পুষ্পিকা - - - - - -	১৬৭
◆ অলঙ্করণ - - - - - -	১৮৩
◆ লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ - - - - - -	২১৩
◆ পাঠভেদ ও পাঠ-বিকৃতি - - - - - -	২৪৭
◆ আপাত অনাবশ্যক 'রেফ'-এর ব্যবহার - - - - -	২৬৫
◆ বাংলা অনুস্বার হরফের ক্রম-বিবর্তন - - - - -	২৮১
◆ একাঙ্গীভূত বা একীভূত শব্দ - - - - - -	২৯১
◆ সাদৃশ্য জনিত প্রতিক্রিয়া - - - - - -	৩০১
◆ সম্পাদক ও সম্পাদনা রীতি - - - - - -	৩১৫
◆ পরিশিষ্ট - - - - - -	৩৩৫
(ক) পুঁথি অনুষঙ্গী শব্দ-টীকা - - - - - -	৩৩৫
(খ) পুঁথির পাতার বানান সমস্যা - - - - - -	৩৪১
(গ) পুঁথির লিপিকলা বিষয়ে দু'চার কথা - - - - -	৩৫৫
(ঘ) সম্পাদক-কৃত পাঠ-বিকৃতি - - - - - -	৩৬৭
◆ তথ্যসূচী-নামসূচী - - - - - -	৩৭৭

গ্রন্থকারের নিবেদন

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে বাংলা পুঁথির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সে সময়ে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে ক্লাসের শেষে, বিকেল চারটের পরে অধীক্ষক শ্রীসুকুমার মিত্রের তত্ত্বাবধানে তিরিশ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক ঘণ্টা করে পুঁথি নকলের কাজ করানো হতো। সেই কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণের ফলেই থরে থরে লাল কাপড়ে জড়ানো, বাংলা সাহিত্যের এক বিচিত্র ও ঐশ্বর্যময় জগতকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে জগতের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় আরও অনেক পরে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে পুঁথি নিয়ে গবেষণা করবার সময়ে। সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে জীর্ণ বিবর্ণ পুঁথির পাতাগুলির সঙ্গে আমার এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। অতীত চারণার এক নতুন আনন্দে আমি বিভোর হই। এরও পরে ১৯৮৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উচ্চতর বৃত্তি নিয়ে গবেষণা করবার সময়ে, প্রথম, পুঁথি সম্পর্কিত নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন মনে জাগতে থাকে। বিশেষভাবে পুঁথির লিপিকলা, ভাষা-বৈশিষ্ট্য, বানান বৈচিত্র্য, অলংকরণ, তথা চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। সুদীর্ঘ সময় ধরে এই গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান পুঁথিশালাগুলিতে বহু পুঁথি দেখবার সুযোগ হয়। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে Editing and cataloguing -এর কাজে পুঁথি বিশেষজ্ঞ হিসেবে যুক্ত হতে পেরে প্রতিদিন বিভিন্ন পুঁথির অক্ষর, ভাষা, ব্যাকরণ, লিপিগত বৈশিষ্ট্য, অলংকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি আরও বেশি করে নজরে পড়তে থাকে। সেই সময় থেকেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুঁথিগুলি থেকে মূল্যবান সব পুষ্পিকা, চিত্রিত পত্র এবং লিপিগত ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রয়োজনে আলোকচিত্র সংগ্রহের কাজ শুরু করি। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের দুই প্রথিতযশা অধ্যাপক, ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল এবং ডক্টর ভবতোষ দত্ত, পুঁথিপাঠ প্রকরণ (Methadology)-এর বিষয়ে একটিবই লিখবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করতে থাকেন। সেই থেকে এ কাজের সূত্রপাত।

দীর্ঘ সাত-আট বছর নিরবচ্ছিন্ন কাজ করবার পরে মনে হলো, এবার একে দুই মলাটের মধ্যে বাঁধবার সময় হয়েছে। কারণ এই ধরণের কাজের কোনো শেষ নেই। যতই দিন যাবে নতুন নতুন পুঁথি পরীক্ষা করবার সুযোগ হবে, ততই নতুন নতুন তথ্য আহরিত হতে থাকবে। এবং এইভাবে চললে এ অনন্ত যাত্রা কোনোদিনই শেষ হবে না। সুতরাং এক জায়গায় জোর করে থামতেই হয়। আর সেই যাত্রা শেষের মুহূর্তই এই বই এর জন্মলগ্ন।

পুঁথিকে ভালোবেসে, পুঁথি নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা তথা গবেষণা করে থাকেন, এরকম গুণীজনের সংখ্যা আজ মুষ্টিমেয়। অতীতে যাঁরা এই বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন এবং এখনও যাঁরা চর্চা করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই একাধিক পুঁথি সম্পাদনা করে, বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করে, পুঁথি-গবেষণার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। এজন্য এঁদের কাছে আমাদের, অর্থাৎ একালের এই পথের পথিক জনের ঋণের সীমা নেই। এই ঋণকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েও, একটি কথা এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, এই সব পথিকৃৎ গবেষকেরা বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করলেও, সামগ্রিক ভাবে পুঁথি বিষয়ক তথ্য ও সম্পাদনা রীতির (Textual Criticism) -প্রকরণ বিষয়ক বাংলায় কোনো সাধারণ আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন নি। অন্তত এ বঙ্গে তো নয়ই। অথচ আমাদের দেশে, বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে হাজার হাজার মূল্যবান পুঁথি, তার নিজস্ব সম্পদ নিয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

আজ থেকে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীরও বেশি আগে, ১৯৪১ সালে আলোচ্য বিষয়ের ওপর 'An Introduction to Indian Textual Criticism' নামে একখানি ইংরাজি বই লিখেছিলেন S. M. Katre। প্রচুর পরিশ্রম এবং পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ সে বইখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বাংলায় এই ধরণের কোনো বই নেই। বর্তমান বাংলাদেশে এই ধরণের কিছু কিছু গবেষণামূলক কাজের খবর পাওয়া যায়। এই মুহূর্তে বাংলা একাডেমী ঢাকা, থেকে প্রকাশিত অন্তত দুটি বই-এর নাম মনে পড়ছে। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম-রচিত 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা' এবং মুহম্মদ শাহজাহান মিঞা-রচিত 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা'। দুটি বই-এর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। দুটি বই-ই গভীর পাণ্ডিত্য ও দীর্ঘ পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করছে। এদের মধ্যে মোহাম্মদ কাইউম-এর বইটি অবশ্য Katre -এর বইটিকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করে এগিয়েছে। যদিও পাঠকদের তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এছাড়াও ঐ একই সংস্থা থেকে প্রকাশিত, ডক্টর কল্পনা ভৌমিকের 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা', বইটিও সুলিখিত। তবে এটি মূলত সংস্কৃত পুঁথির উপর ভিত্তি করে আলোচনা। কিন্তু বলা বাহুল্য এই বইগুলিও আমাদের কাছে খুব সুলভ নয়।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'চর্যাপদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থদ্বয়ে, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিতে, পুঁথি সম্পাদনার রীতি-নীতি, পুঁথির পাঠ-বিচার, লিপিকলা, পাঠ-বিভ্রাট জনিত সমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন। সে আলোচনায় অগাধ পাণ্ডিত্য ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ে পুঁথির অনেক গভীরে প্রবেশের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে গ্রন্থের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি বাক্যে। পুঁথি সম্পাদনা বিষয়ক বহু প্রসঙ্গের আলোচনা উক্ত গ্রন্থে স্থান লাভ করলেও, যেহেতু কেবলমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুঁথিই গ্রন্থখানির উপজীব্য, সেইহেতু আলোচ্য গ্রন্থের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করতেই হয়। এছাড়াও, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম দাস, প্রফুল্লকুমার পাল, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পীযুষ কান্তি মহাপাত্র, অক্ষয়কুমার কয়াল প্রমুখ বহু পুঁথিবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি একাধিক পুঁথির সম্পাদনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশের গ্রন্থের ভূমিকা, পাদটীকা, পাঠ-পাঠান্তর, টীকা-টিপ্পনী সহ গ্রন্থগুলি কেউ যদি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন, তাহলেও পুঁথি সম্পাদনা সম্পর্কিত অনেক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। তা সত্ত্বেও, একটি

স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন থেকেই যায়। যাতে সাধারণভাবে পুঁথি সম্পর্কিত নানান তথ্য পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে S.M. Katre -র একটি উক্তি এখানে স্মরণ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "With the increasing interest shown by Indian Scholars in editing their ancient classics, from manuscripts presurved in India or abroad, the need of a short manual giving the main principles of textual criticism and showing the proper methods of critical editing is greatly felt."

বেশ কয়েক বছর আগে, বর্তমান লেখিকার "আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ" বইটি পড়ে জনৈক ইতিহাসের অধ্যাপক বলেছিলেন, 'আজকাল মধ্যযুগের ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করতে অনেককেই সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু পুঁথি পড়তে না জানবার কারণে ছাপা বই-এর ওপরই নির্ভর করতে হয়। আপনি এমন একটা বই লিখুন, যা পড়ে আমরাও পুঁথি পড়তে শিখতে পারি'।

বর্তমান বইটি পড়ে পুঁথি পড়তে শেখা যাবে কিনা জানি না, তবে এটি সে পথের পথিকের অন্যতম প্রাথমিক সোপান হলেও হ'তে পারে। আসলে পুঁথি-পাঠ এক দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ব করা বিদ্যা মাত্র। যে কোনো অধীত বিদ্যার মতোই এটিও অবশ্যই ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের দাবী রাখে। পুঁথি পড়তে শেখবার সম্ভবতঃ সহজতম উপায়, একটিমাত্র পুঁথি নিয়ে, তাকেই বার বার পড়বার চেষ্টা করে যাওয়া। প্রথম প্রথম অধিকাংশ শব্দই দুর্বোধ্য মনে হলেও, তাতে ধৈর্য হারালে চলবে না। দুর্বোধ্য শব্দকে বাক্যের প্রসঙ্গের সাহায্যে মিলিয়ে পড়তে চেষ্টা করলে, তাকে সনাক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। দুর্বোধ্য অক্ষরগুলিও একইভাবে পরিচিত শব্দের মধ্যে দেখে, তাকে সনাক্ত করা সহজতর হয়ে ওঠে। পরে সেই সেই অক্ষর অন্য কোথায়, কোন্ শব্দের মধ্যে আছে, তার সন্ধান করতে পারলে, দুর্বোধ্য অক্ষর অতি সহজেই পরিচিত হয়ে উঠতে পারে। এই পদ্ধতিতে পুঁথি পড়তে শিখতে হলে প্রথমে অবশ্যই বাংলা হরফের ক্রম-বিবর্তন ধারা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণেই বর্তমান গ্রন্থে, ব্রাহ্মীলিপি থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাংলা অক্ষরের একটি বিবর্তন চিত্র সংযোজিত করা হয়েছে। সেই চিত্রটি পাঠককে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। এইভাবে পুঁথি-পাঠের অভ্যাস করবার সময়ে আরও একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। তা হলো, পুঁথি যত অর্বাচীন হবে, সে পুঁথি পড়া তত সহজ হবে। সুতরাং পুঁথি-পাঠ অভ্যাসের সময় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পুঁথি থেকে, ক্রমশঃ প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর পুঁথির দিকে এগোনোই কাম্য।

এই প্রাথমিক জ্ঞান হবার পরে রয়েছে, পুঁথি সম্পর্কিত নানান বিষয়। তার ভাষা, ছন্দ, বানান, ব্যাকরণ, তোলাপাঠ, পাঠান্তর, লিপিকাল-নির্দ্ধারণ, কবি শকাঙ্ক, ভণিতা, পুষ্পিকা ইত্যাদি খুঁটিনাটি অনেক কথা। যা এই বই-এ সাধ্যমত আলোচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পুঁথি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের পরেই, পুঁথি সম্পাদনার প্রশ্ন আসে। আজকাল কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে Manuscriptology -র পাঠক্রম চালু হয়েছে। শোনা যায় কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ছয় মাসের এই পাঠক্রমের প্রথম তিনমাস পুঁথি পড়তে শেখানো হয়, এবং পরের তিনমাসে

সেই সব ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে পুঁথি সম্পাদনার কাজ করানো হয়। এই কর্মযজ্ঞের যাঁরা হোতা, ঈশ্বর তাঁদের ক্ষমা করুন।

এঁদের কথা বাদ দিলেও, আমাদের দেশে যাঁরা পুঁথি সম্পাদনা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা পুঁথি সম্পাদনার কারিগরি বিষয়গুলি তথা রীতি নীতি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক নন। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এক জায়গায় বলেছেন, 'যদৃচ্ছক্রমে সংগৃহীত একাধিক পুঁথির একখানির পাঠকে মূলপাঠ রূপে গ্রহণ করিয়া মধ্যে মধ্যে অপর পুঁথিগুলিতে প্রাপ্ত পাঠান্তর লিপিবদ্ধ করিলেই বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রস্তুত হয় না।' ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এঁদের সম্পাদিত পুঁথি হয়ে ওঠে ভুলে ভরা। লিপিকরকৃত প্রমাদের সঙ্গে সম্পাদককৃত প্রমাদ যুক্ত হয়ে, কবিকৃতি থেকে পাঠককে ক্রমশই দূর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু অভিজ্ঞ সম্পাদকের কাজ হলো পাঠককে কবির অভিপ্রেত পাঠের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া। এ সম্পর্কে Katre বলেছেন, 'with very few exceptions the critical editing as texts in India is laging behind, and the editors have neither the training nor the proper guidance to qualify them for their task" তবে এমন কথা অবশ্যই বলা যায় না যে, যোগ্যতম সম্পাদকও একেবারে নির্ভুল সম্পাদনা করতে পারবেনই। তবুও ভুলের তারতম্যের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হয়।

কোনো পুঁথি সম্পাদনা করতে হলে, শুধুমাত্র পুঁথি পড়তে পারলেই যে চলবে না, একথা বলাই বাহুল্য। ভাল পুঁথি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে, যে কালের কাব্য-কাহিনী সম্পর্কিত পুঁথিখানি সম্পাদনা করা হবে, সেই সময়কার রীতিনীতি সামাজিক ধ্যান-ধারণা, ভাষা ইত্যাদি বহু বিষয় সম্পর্কেই সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এর মধ্যে বেশি প্রয়োজন সম্ভবত ভাষাজ্ঞানের। কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক শব্দই বর্তমানে অপ্রচলিত। সেই সব অপ্রচলিত তথা, অপরিচিত শব্দ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় সম্পাদনা কালে, সেই সব শব্দরাজিকে অর্থহীন জ্ঞানে বর্জন করে, উক্ত শব্দের কাছাকাছি সামঞ্জস্যপূর্ণ, নতুন কোনো পরিচিত শব্দ সংযোজন করবার দিকে আধুনিক কালের সম্পাদকদের একটা ঝোঁক দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে পুঁথিতে প্রাপ্ত শব্দটি যেমন মনে হচ্ছে, ঠিক তেমনভাবেই গ্রহণ করলে লিপিকরকৃত পাঠ-বিকৃতির ওপরে আবার সম্পাদককৃত নবতর পাঠ-বিকৃতির সম্ভাবনা রোধ করা সম্ভব। অপরপক্ষে সম্পাদক কর্তৃক যদৃচ্ছভাবে অপরিচিত শব্দরাজি বর্জন করে, যুক্তি বিচার প্রয়োগে সেই স্থলে পরিচিত শব্দের ব্যবহারের প্রতি ঝোঁক, যে সব পাঠ-বিকৃতির সৃষ্টি করে, পরবর্তী কালে নতুন কোনো সম্পাদক কর্তৃক সেই সব পাঠ-বিকৃতি নিরসন করে আবার সঠিক পাঠ-নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ।

প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনায় যে সব রীতি ইদানিং ব্যবহৃত হয়ে চলেছে, তার অনেক স্থলেই পূর্বাবধি হস্তাবলিপ্ত কবি কর্মের ওপরে, পাণ্ডিত্য সমর্থিত নূতনতর অবলেপের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মূল কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া না গেলে, বিভিন্ন খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে সমগ্র কাব্যটি পুনর্গঠনের চেষ্টা করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু তারও একটা সুনির্দিষ্ট রীতি থাকা উচিত। আবার যে সব ক্ষেত্রে প্রখ্যাত কবিদের ভণিতায় একাধিক সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে, অথচ তাতে পাঠ-সাদৃশ্যের বিশেষ অভাব, সেরকম ক্ষেত্রে বিদগ্ধ সম্পাদকেরা

বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পুঁথি থেকে বিভিন্ন অংশের যুক্তি সিদ্ধ পাঠ সংযোজন ক'রে প্রামাণ্য পাঠের একটি সম্ভাব্য রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই রীতি আরও মারাত্মক। কারণ যুক্তি বিচারের সমর্থন যতই থাক, এই রীতিতে সংকলিত 'পাঠ' সম্ভাব্য যদি হয়ও, তবু প্রামাণ্য বলে কিছুতেই গৃহীত হ'তে পারে না। এ-কালের পণ্ডিতের যুক্তি অনুসরণ করে সেকালের কবির কল্পনা সৃজনকর্মে প্রবাহিত হয়েছিল, এমন ভাবনা সর্বাংশেই সংগত নয়। তাছাড়া, পণ্ডিতদের যুক্তি-বিচারেও তো সর্বত্র মতৈক্য নেই। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে পুঁথিতে প্রাপ্ত অপরিচিত, এমন কি আপাত অর্থহীন শব্দ বা শব্দরাজিকে সম্পাদিত কাব্যে মূলানুগ ভাবে স্থান দিলে, ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে তার অর্থোদ্ধারের অন্তত একটা সম্ভাবনা থাকে, অন্যথায় তাও লুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন কাব্যের সম্পাদনা প্রসঙ্গে একটা ধারণা এতদিন পরে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, যুক্তি-তর্ক করে কোনো কবি-কৃতির 'আদর্শ পাঠ' গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পণ্ডিতেরা কবি-কর্মের বিচারক যদি হনও, নির্মাতার ভূমিকা তাঁদের কিছুতেই হতে পারে না। অথচ বিদগ্ধ পণ্ডিত দ্বারাও এই কাজটি হয়ে চলেছে অনেক ক্ষেত্রেই।

পুঁথির পাঠ বিচার কালে উদ্দিষ্ট কবির সমসাময়িক কালের প্রচলিত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও সম্যক অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় সম্পাদিত কাব্যখানি কবিকৃত রচনা না হয়ে সম্পাদককৃত রচনা হয়ে উঠবে। কিন্তু পূর্বাবধি বহু হস্তাবলিপ্ত কবি-কর্মের ওপরে আবার পাণ্ডিত্য সমর্থিত নূতনতর অবলেপের প্রয়াস কোনো ভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। তাই প্রাচীন কাব্য সম্পাদনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত পুঁথির মূলানুগ সম্পাদনা। একমাত্র এই পথেই প্রাচীন কাব্যের কবি-অভিপ্রেত রূপের কাছাকাছি আমরা পৌঁছাবার প্রয়াস করতে পারি মাত্র।

ইতিপূর্বে আমরা পুঁথি-পাঠ শিক্ষার প্রাথমিক পর্বের প্রসঙ্গে বলেছি, দুর্বোধ্য শব্দগুলি বাক্যের প্রসঙ্গের সাহায্যে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। এবং দুর্বোধ্য এক বা একাধিক অক্ষরকে পরিচিত শব্দের মধ্যে, তার ব্যবহার থেকে সনাক্ত করবার চেষ্টা করাই সম্ভবত সহজতর উপায়। কিন্তু প্রাথমিক ভাবে পুঁথি-পাঠ শিক্ষার প্রসঙ্গে যে কথা একান্ত সত্য, পুঁথি সম্পাদনার সময়ে কিন্তু এই পথ সর্বাংশেই বর্জনীয়। অর্থাৎ প্রাজ্ঞ সম্পাদক অবশ্যই এই পথে চলবেন না। কারণ সেক্ষেত্রে ভুল পাঠ গ্রহণের সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। অর্থাৎ গ্রন্থ সম্পাদনাকালে প্রসঙ্গের আশ্রয়ের পরিবর্তে লিপি-কলার আশ্রয়েই পাঠ নির্ণয় করা কর্তব্য। এ সম্পর্কে অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, "সম্পাদক পাঠ নির্ণয় করবেন লিপি এবং ব্যাকরণের নির্দেশে, অর্থ সঙ্গতি রক্ষা সম্পাদকের দায়িত্ব নয়"। তাঁর মতে, লিপিকলা বিশ্লেষণ না করে পুঁথির পাঠোদ্ধার করতে গেলে, অর্থাৎ লিপিকলার পরিবর্তে, প্রসঙ্গের আশ্রয়ে পাঠ-নির্ণয় করতে গেলে সম্পাদককৃত নানা রকম পাঠ-বিভ্রাট সৃষ্টি হতে পারে।

তবে এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব। সে সব ক্ষেত্রে অনন্যোপায়। যেমন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির কথাই ধরা যেতে পারে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুঁথিতে পাঁচটি অক্ষর মূলত এক। এই পাঁচটি অক্ষর হ'ল, 'ঈ', 'ঙ্গ', 'কু', 'গ্ন', এবং 'দ্দ'। এই অক্ষর পাঁচটির ক্ষেত্রে কোনটি কি, তা প্রসঙ্গের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা না করে,

অন্য উপায়ে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে 'কু' 'গ্ন' এবং 'দ্দ' পার্থক্যহীন। অর্থাৎ 'কাকুতী'- কে 'কাদ্দতী' পড়লে কিংবা 'সগ্ন' কে 'সদ্দ' পড়লে লিপিকলার দিক থেকে কোনো ভুল হয় না। এই ধরণের নানা প্রসঙ্গ গ্রন্থ মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আর অধিক বিস্তার কাম্য নয়।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় আমার দীর্ঘ পরিশ্রমকে স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, এতে আমার কোনো রকম নিজস্বতার দাবীর প্রশ্ন নেই। বিভিন্ন সময়ে নানান পণ্ডিতজনের ভাবনার ফসল, পরিশ্রমের ফসল তথা পূর্বসুরীদের গবেষণালব্ধ বিষয় থেকেই আমার বর্তমান গ্রন্থের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে সর্বত্রই তথ্যসূত্রে তাঁদের মতামতের উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়েছে। তবে, এই ঋণের পরিমাণ এতই বেশি যে, কেবলমাত্র ফুটনোটের উল্লেখেই তার শেষ হয় না। আবার পূর্বসূরীদের রচিত বইগুলি আমার বর্তমান গ্রন্থ রচনার প্রতি পদক্ষেপে এমনভাবে সাহায্য করেছে, তাঁদের চিন্তাভাবনা, তাঁদের প্রকাশরীতি, এমন কি কখনও কখনও তাঁদের ভাষা পর্যন্ত জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে আমার গ্রন্থে গৃহীত হতে পারে। এছাড়া, বিভিন্ন সময়ে নানান পণ্ডিতকৃত পুঁথির 'বর্ণনামূলক তালিকা'গুলিও আমাকে এই কাজে বিশেষ সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত 'পুঁথি-পরিচয়'-এর পাঁচটি খণ্ডের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে অন্যান্য তালিকাগুলি বিচ্ছিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ। আমাদের দেশে পুঁথির ইতিহাস (History of Manuscript) বিষয়ক কোনো গ্রন্থ প্রণয়ন হয় নি। তা যদি করা সম্ভব হত, তবে পুঁথি সম্পর্কিত বহু অজানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেত। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য, পুঁথির লিপিকলা এবং পুষ্পিকা প্রসঙ্গে। আমরা আজও নিশ্চিত ভাবে জানতে পারি নি যে, পুঁথির পুষ্পিকার একদল পুষ্প, চতুর্দল পুষ্প বা অষ্টদল পুষ্পের মধ্যে কোনটি প্রাচীন? অর্দ্ধবাহু 'জ' অথবা পূর্ণবাহু 'জ', কোনটি প্রাচীনতর? পংক্তি শেষের নানা ধরণের পূর্ণচ্ছেদ চিহ্নের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতম? পুঁথি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে এই ধরণের বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলেও, এ সম্পর্কে আমরা কতকগুলি অনুমান করতে পারি মাত্র। নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারা যায় না। কোনো একক প্রচেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান খোঁজা বৃথা। যৌথ উদ্যোগে, দীর্ঘ মেয়াদী কোনো কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা ব্যতীত এ কাজ করা সম্ভব নয়। অথচ কাজটি বড়ো জরুরি।

বর্তমান গ্রন্থটি অনেক দিক দিয়েই অসম্পূর্ণ। এখানে সীমিত যোগ্যতায়, কয়েকটিমাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো। পুঁথির ব্যাকরণ ও অক্ষরের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরিশিষ্ট অংশে এই প্রসঙ্গে যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। যদি কখনও এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, অথবা ভবিষ্যতে অন্য কোনো গ্রন্থে, এই বিষয়ে আলোচনা করবার আকাঙ্খা রইলো। আপাতত এই টুকুতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে সন্তুষ্ট থাকতে চাই।

বর্তমান বইটির রচনার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমি নানা সময়ে নানা জনের কাছে অনেক উপকৃত হয়েছি।

এই বিষয়ে প্রথম থেকেই যে দুজন সব সময়ে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় দুই অধ্যাপক, বাংলা পুঁথির জগতে প্রবাদপুরুষ, ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল এবং বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক, ডক্টর ভবতোষ দত্ত।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের অলংকৃত পুঁথিগুলির আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন, তৎকালীন উপাচার্য ডক্টর নিমাই সাধন বসু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের তৎকালীন সচিব, ডক্টর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের পুঁথিগুলির আলোকচিত্র গ্রহণ ও ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

পুঁথি বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কয়াল, তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু মূল্যবান পুঁথি ব্যবহার করতে দিয়ে যে সহযোগিতা করেছেন, তা উল্লেখের দাবী রাখে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবীন গ্রন্থাগারিক, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি বিভাগের প্রধান, শ্রীরাধিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথি বিভাগের কর্মী শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এঁদের সকলের সহযোগিতার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য।

আমার স্বামী, অধ্যাপক দীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থটি রচনা থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে উৎসাহ দান ও নিরলস সাহায্য করে এসেছেন, তাঁর অবদান গ্রন্থের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। পুত্রবধূ অধ্যাপিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী) এর উৎসাহ এবং পরামর্শও এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে।

গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলি প্রস্তুত করে দিয়েছেন, পুত্র শ্রীকৌশিক মুখোপাধ্যায়।

পুনশ্চ প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধার শ্রীসন্দীপ নায়ক, নিজে আগ্রহী হয়ে বইটি প্রকাশের গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন এবং যথাসম্ভব সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার চেষ্টা করেছেন।

এঁদের সকলের কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

বইটি যদি আগামী দিনের নতুন প্রজন্মের দু'চারজন গবেষককে কিছু মূল্যবান পুঁথি সম্পাদনায় উৎসাহিত এবং সেই সঙ্গে সামান্যতম সাহায্যও করে, তবেই আমার এই শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

অনিমা মুখোপাধ্যায়

৭ই জানুয়ারী, ২০০১
পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন।

পুঁথি শব্দের উৎপত্তি ও ভাষাতত্ত্বগত তাৎপর্য

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকের কিছু অংশে পারসিক শাসন উভয় জাতির মধ্যে যৎসামান্য হলেও একটি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এরই ফলশ্রুতিতে খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর মুসলিম (তুর্কি) অভিযান পর্যন্ত ভারতীয় আর্য ভাষায় বেশ কিছু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পারসিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। সম্রাট অশোকের লিপিতে এই ধরনের কিছু শব্দের হদিস মেলে যেমন, 'দিপি', (Dipi) 'নিপিস্ত' (Nipista), ইত্যাদি। তুর্কি, তাজিক এবং আফগানগণ দ্বারা মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এদেশের মুসলিম আদালতে ও অন্যত্র ফারসি (persian) ব্যবহারিক ভাষা হয়ে ওঠে, যার ফলে উত্তর ভারতীয় আর্যভাষা সরাসরি ফারসি ভাষার সংস্পর্শে আসে ও প্রভাবান্বিত হয়। ফারসি ছাড়া গ্রিক ভাষাও ইন্দো-আর্য ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭-এর আগে আলেকজান্ডারের অভিযানের পূর্বেও গ্রিক অভিযাত্রী এবং পারসিক রাজকর্মে নিযুক্ত গ্রিক রাজকর্মচারী অনেকে ভারতে আসেন। অবশ্য ৩২৭ খ্রিষ্টপূর্বের পরবর্তী শতাব্দ থেকে শুরু করে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত গ্রিক-ভারতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ও ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকে এবং এর ফলস্বরূপ দুই ভাষাতেই অপর ভাষা তথা, শব্দের আত্মীকরণ ঘটে যায় স্বাভাবিক নিয়মেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্যভাষায় ও সংস্কৃতে বহু গ্রিক শব্দের অনুপ্রবেশ এই পথেই। আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষা এইভাবেই বহু ফারসি ও গ্রিক শব্দকে নিজের করে নিয়েছে। ইন্দো-আর্য ভাষার ধ্বন্যাত্মক তদ্ভব রূপের মধ্যে যার সঠিক রূপটি ধরা পড়ে। খ্রিষ্ট-পরবর্তী সময়ে কিছু ইরানি শব্দেরও প্রবেশ ঘটে মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য ভাষায়। যেমন, 'মিহির' (Mihira = সূর্য), পুস্ত (Pust = বই) = [মর্ধ্য পারসিক (পহ্লভী) Post (পোস্ত) = Skin for writing অর্থাৎ লিখিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চামড়া] ইত্যাদি।

আদি ও মধ্যযুগীয় পারসিক > মধ্য ভারতীয় আর্য পুথী, পুথি, পুঁথি [puthi, puthi, puthi] বই, প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে লেখা পাণ্ডুলিপি। প্রাচীন রূপ > পোথী [Pothi] মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য >পোত্থিয়া [Potthia] ইরানীয় [পহ্লভী Pollavi] পুস্ত (Post) = [Skin, Perchment = চামড়া, গাছের ছাল]; সংস্কৃতে > পুস্ত, পুস্তক, পুস্তিকা [Pust, Pusta-ka, Pust-ika][১]

ভাষাতত্ত্বের একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণে পোথী > পুথিতে পরিণত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এক ধরনের স্বর-পরিবর্তন দেখা যায়, যেখানে পরবর্তী 'দল' (Syllable) -এ যথাক্রমে উচ্চ বা নিম্ন স্বর থাকলে পূর্ব 'দল' স্থানের স্বর উচ্চ বা নিম্ন আকার নেয়।

যাকে স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) বলা হয়। মধ্যযুগের বাংলায় 'পোথা' (বড়ো পুঁথি) বা 'পোথী' (ছোটো আকারের পুঁথি) উপরোক্ত স্বরসঙ্গতির নিয়মে 'পুথি' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'পোথা' শব্দের লঘু 'আ' বা 'পোথী' শব্দের 'ঈ', পূর্ববর্তী 'দল'-এর 'ও' কারকে 'উ'-তে পরিণত করেছে।

সংস্কৃত ভাষায় যে স্বতঃ নাসিক্যি ভবন (Spontaneus nasalisation) প্রসূত অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দুর স্বর প্রক্ষেপ দেখা যায়, যাকে শব্দ তাত্ত্বিকেরা ক্ষেত্রবিশেষে স্বাভাবিক আনুনাসিক ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষাতে এবং উত্তর ভারতীয় বা পশ্চিমী হিন্দিতেও এই স্বতঃনাসিক্যি ভবনের প্রক্রিয়াটি লক্ষ করা যায়। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় এই যে, একই শব্দ বাংলায় যখন অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দু যুক্ত, উত্তর ভারত বা পশ্চিমী হিন্দিতে সেই শব্দে আনুনাসিক স্বরের বিলুপ্তি বা ব্যতিরেক, অথবা হিন্দিতে প্রচলিত, বাংলায় অবলুপ্ত হতে দেখা যায়। পুঁথি শব্দের উচ্চারণ প্রক্রিয়াতেও এই ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়। পুঁথি (Puthi) (Ponthia); হিন্দি ব্যতিক্রম (পোথি) (Pothia)। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা পুঁথি শব্দটি সংস্কৃত 'পন্থিয়া' (Ponthia) শব্দ থেকে এসেছে বলে অনুমান করেছেন।

আবার আচার্য সুনীতি কুমারের মতে প্রাথমিকভাবে 'পুথি' বা 'পুঁথি' শব্দের 'থ' ব্যঞ্জন বর্ণটি এসেছে সংস্কৃত 'স্ত' বা 'স্থ' থেকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্তম্ভ > থাম। এইভাবেই সংস্কৃত 'পুস্তক' বা 'পুস্তিকা' শব্দে 'স্ত' রূপান্তরিত হয়েছে পুঁথি শব্দে। পুথি, পুঁথি< Puthi, Puthi > (Pustika)[২]

সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দে 'ইকা' যুক্ত হতে দেখা যায় শব্দের শেষে। যেমন 'মৃত্তিকা'। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃতে এবং বাংলায় শব্দের শেষের এই 'ইকা', 'ঈ', 'ই'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার বাংলা ভাষায় অপ্রাণীবাচক বা সামান্য বস্তুর ক্ষেত্রে এই 'ঈ' বা 'ই' লিঙ্গ নির্ধারক না হয়ে, শ্রুতিমাধুর্যের কারণেও শব্দের শেষে যুক্ত হতে দেখা যায়। এইভাবেই এসেছে 'পুথী' < (Puthi) > 'পুঁথি' (Puthi) ভারতীয় পাণ্ডুলিপি, বই (Pust-ika), মধ্যযুগীয় বাংলায় পোথা < (Potha) > (Pustaka) ইত্যাদি।[৩]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল, পুঁথি শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে ভাষাতত্ত্বগত চার প্রকার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

(১) ইরানি শব্দ 'পুস্ত' (বই) > সংস্কৃত 'পুস্ত' পুস্ত-ক', অপ্রাণীবাচক এবং সামান্য বস্তুর কারণে শব্দের শেষে— 'ইকা'-যুক্ত হয়ে 'পুস্তিকা' [Pust, Pust-ka, Pust-ika] শব্দের উৎপত্তি।

(২) এই পুস্তক বা পুস্তিকা শব্দের 'স্ত' (St) পরবর্তীকালে 'থ' (th) -এ রূপান্তরিত হয়েছে। পুথি, পুঁথি (পুস্তিকা > পুথিয়া)।

(৩) স্বরসঙ্গতির নিয়ম অনুসারে পরবর্তী 'দল'-এর উচ্চ বা নিম্ন স্বর, পূর্ববর্তী 'দল'-এর স্বরকে যথাক্রমে উচ্চ বা নিম্ন করে। 'পোথা' শব্দের নিম্ন স্বর 'আ' বা 'পোথী', শব্দের উচ্চ স্বর 'ঈ', পূর্ববর্তী 'ও' কার (পো)-কে 'উ' কারে (পু) রূপান্তরিত করেছে।

(৪) আবার স্বাভাবিক নাসিক্যি ভবন-এর নিয়ম মেনে 'পুথি' শব্দ আনুনাসিক ধ্বনি পরিবর্তনে 'পুঁথি' হয়েছে, অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়েছে।

বই বোঝাতে আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকেই 'পুস্তক' ও 'পুঁথি' শব্দের সঙ্গে আরও একটি শব্দ পাওয়া যায়। সেটি হল 'গ্রন্থ'। গ্রন্থ শব্দের অর্থ বন্ধন। 'গ্রন্থি', 'গ্রন্থনা' বা 'গ্রন্থিবন্ধ' ইত্যাদি আমাদের অতি পরিচিত শব্দ থেকেই গ্রন্থ শব্দের উৎপত্তি। অন্যদিকে 'পুস্তক' শব্দের অর্থও সেই বন্ধনই। পুস্তক শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'পুস্ত' শব্দ থেকে, সংস্কৃত ভাষায় যার অর্থ 'বন্ধ'।

বই-এর সঙ্গে এই বন্ধন শব্দের এমন একাত্মতার কারণ হল, গ্রন্থ তথা পুঁথি বলতে সেকালে বোঝাত একগুচ্ছ তালপত্র বা ভূর্জপত্র—যার ঠিক মাঝখানে একটি ছিদ্র রাখা হত, সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বন্ধনসূত্র ঢুকিয়ে পুঁথির পত্রগুচ্ছকে বেঁধে রাখা হত। এবং সেই পত্রগুচ্ছকে সুরক্ষিত করবার জন্য তার উপরে ও নীচে দুটি কাঠের ফলক বা পাটা দিয়ে আটকানো থাকত। অনেক সময়ে এই কাজে কাঠের পাটার পরিবর্তে চামড়ার ব্যবহারও লক্ষ করা যায়।

বই-এর সঙ্গে বন্ধন শব্দের যেমন একাত্মতা রয়েছে, তেমনি গাছের ছাল, পাতা ইত্যাদির সম্পর্কও নিবিড়। সংস্কৃত 'পুস্ত' শব্দের অর্থ যেমন বন্ধ, তেমনই ইরানীয় (পল্লভী, Pallavi) পুস্ত (Post) শব্দের অর্থ চামড়া, গাছের ছাল (Skin, Perchment) ইত্যাদি। শুধু এদেশেই নয়, বিদেশেও বই সংক্রান্ত বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি লক্ষ করলে এই একই ইতিহাস পাওয়া যায়।

লাতিন শব্দ 'ফোলিয়েজ'-এর অর্থ গাছের ছাল। এই ফোলিয়েজ শব্দ থেকে এসেছে 'ফোলিও' অর্থাৎ ভাঁজ করা পাতা। 'ফোলিও ভল্যুম' অর্থে বড়ো আকারের বই। অর্থাৎ আমাদের দেশের ভূর্জপত্র তালপাতার পুঁথিরই স্বগোত্র। লাতিন ভাষায় অবশ্য 'বই' বলতে আর একটি শব্দ রয়েছে 'লিবার'। যার থেকে লাইব্রেরি শব্দের উৎপত্তি। বিলেতের 'বিচ' গাছের মসৃণ ত্বক লেখালেখির পক্ষে ছিল খুবই উপযুক্ত। যে কোনোও ধরনের পাণ্ডুলিপি ধরে রাখবার আধার হিসেবে এই বিচ গাছের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় সেখানে। অ্যাংলো স্যাকসন যুগে এই বিচ গাছের স্যাক্সনি নাম ছিল 'বোক'। এই 'বোক' শব্দটি কালক্রমে উচ্চারণের ক্রমবিবর্তনে হয়েছে 'বুক'। গ্রিস দেশে আবার এই একই উপকরণ হিসেবে বিচ গাছের বদলে পাই প্যাপিরাস গাছ। বর্তমান 'পেপার' শব্দের সঙ্গে যার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। আবার এই প্যাপিরাস গাছের ভিতরের ত্বক বোঝাতে গ্রিক শব্দ 'বিবলোজ' থেকেই এসেছে বাইবেল, বিবলিওগ্রাফি, বিবলিও ফাইল, বিবলিওথেক ইত্যাদি। আমাদের আটপৌরে শব্দ 'বই'— এর উৎস খুঁজতে দ্বারস্থ হতে হয় আরবি ভাষার। আরবি শব্দ 'বহি' থেকে এসেছে বই। যদিও আরবি 'বহি' বলতে বোঝায় শুধুই ধর্মপুস্তিকা। সাধারণ যে কোনো বই বোঝাতে আরবিতে আর একটি শব্দ আছে 'কেতাব' বা 'কিতাব'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই গ্রন্থের সঙ্গে গাছের ছাল বা পাতার সম্পর্ক নিবিড়।

পাণ্ডুলিপি পুঁথি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। পাণ্ডুলিপি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, [পাণ্ডু (পা+উ-কর্মবা) শুক্লপীত বর্ণ বা ধূসর বর্ণ, লিপি (লিপ্ + ই-কর্মবা) লিখিত পত্রাদি] ধূসর বর্নের লিখিত পত্রাদি। প্রাচীন যুগে পশুচর্ম, ভূর্জপত্র, তালপত্র ইত্যাদি লেখার উপকরণগুলি লেখার উপযোগী হিসেবে তৈরি করতে শুকিয়ে নিতে গিয়ে এগুলি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করত। প্রাচীন গ্রন্থগুলি এই সব পাণ্ডুবর্ণের উপাদানে লেখাহত বলে এদের বলা হত পাণ্ডুলিপি। পুঁথি বলতে এই পাণ্ডুলিপি শব্দের ব্যবহার অনেক পরবর্তী কালের, সম্ভবত এদেশে ইংরেজদের আগমনের পরে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে, সেকালের পুঁথি ও বর্তমান কালের পুস্তকের, তথা বই-এর মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। যে কোনো বই-এর পাতাগুলি যেমন একসঙ্গে সেলাই করে বাঁধা থাকে, যাতে করে একটি থেকে অপরটি আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, পুঁথির পাতার বেলায় কিন্তু ঠিক তার বিপরীত কথাটিই সত্য। তালপাতার পুঁথিই হোক আর হাতে তৈরি তুলট কাগজের পুঁথিই হোক, তাদের প্রত্যেকটি পাতাই খোলা বা পরস্পর পৃথক অবস্থায় থাকে। অনেক সময়ে সেই পাতাগুলির ঠিক মাঝখানটিতে রাখা নির্দিষ্ট একটি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে বন্ধন সূত্রটি ঢুকিয়ে দিয়ে এলোমেলো পাতাগুলিকে একত্রিত করে বেঁধে রাখা হত।

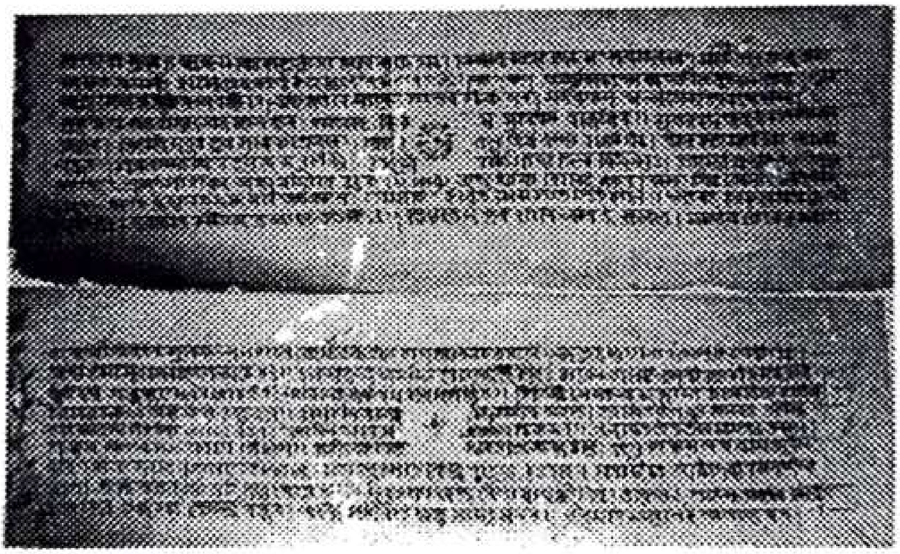

তুলট কাগজের পুঁথির পাতার মাঝখানে বন্ধনসূত্রের জন্য রাখা শূন্যস্থান

তথ্য-নির্দেশ

১। Origine and Development of Bengali Language–by Suniti Kumar Chatterjee, Vol.1, Page-194.

২। Ibid. P. 503-504.

৩। Ibid. Vol.2. Page-672-73.